B6658

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য

891.4409
দ্বিজেন্দ্র/আ

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি
ও
বাংলা সাহিত্য

B৬৬৫৮

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

॥ জিজ্ঞাসা ॥
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
১৯৬০

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র—১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সর্বসত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক :
শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

STATE ... LIBRARY
...GAL
...CUTTA

উৎসর্গ

আমার সাহিত্যচর্চার প্রথম প্রেরণাদাতা
পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দের সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি অত্যন্ত সজাগ হয়ে পড়েছি। যে সব ব্যক্তি ও কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ও দৃঢ় ছিল সে সম্বন্ধেও আমরা কথা বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি, যদিও বিন্দুমাত্র নতুন কথা বলবার নেই। আসলে, উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের জীবনের ও চারিত্র্যের মান থেকে আমরা যতই নামছি আমাদের কল্পিত-অকল্পিত বীরপূজা ততই যেন বাড়ছে। নতুন করে মূল্যনিরূপণ হচ্ছেনা, কেননা তার উপযুক্ত নতুন মালমশলা আবিষ্কৃত হয়নি এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিও আমাদের নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ তাঁর এই 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য' বইটিতে প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তিনি যথাসম্ভব মধ্যস্থতা অবলম্বন করেছেন বলেই মনে করি। যদিও কোন কোন বিষয়ে আমি স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করি তবুও বলব যে দ্বিজেন্দ্রলালবাবুর বক্তব্য অবধানের যোগ্য। বইটি সুখপাঠ্য, সুতরাং সাধারণ পাঠক পড়তে বাধা পাবেন না। বিষয় সুনির্বাচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সহায়ক হবে।

দ্বিজেন্দ্রলালবাবুকে গ্রন্থকারসভায় স্বাগত করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা ২. ৮. ৬০

শ্রীসুকুমার সেন

নিবেদন

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির পটভূমিকায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখ্য ধারাগুলির অনুসরণে একখানি আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা আমার বহুকালের। কিন্তু কর্মোপলক্ষে বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ইতিপূর্বে আমার অভিপ্রায়কে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর পূর্বে কলকাতা আসার পর থেকে এ বিষয়ে সচেষ্ট হই, এবং উক্ত বিষয়ে আমার চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করি। কিছুকাল পরে কর্মসূত্রে কবি-সমালোচক ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে। আমার আলোচ্য বিষয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনাই এই গ্রন্থের পূর্বভাগ-সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কালবৃত্তের মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ। সময় ও সুযোগমত বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি এবং সাহিত্যালোচনা করবার ইচ্ছা রইল এই গ্রন্থের উত্তরভাগে।

সংস্কৃতির পটভূমিকায় আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ বা বিকাশধারা লক্ষ্য করবার দুরূহ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে খুব বেশি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই অবস্থায় এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত চিন্তার কোন মূল্য আছে কিনা তার বিচার করবেন বিদগ্ধ পাঠক। এই পুস্তকে প্রকাশিত আমার সকল চিন্তা যে সংশয়াতীত এবং মত ভ্রান্তিহীন এমন কথা ঘোষণা করবার দুঃসাহস আমার নেই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা এই গ্রন্থের যে কোন প্রকার ত্রুটি আমার গোচরীভূত করলে পরবর্তী সংস্করণে সানন্দে আমি তা সংশোধন করে নেব।

ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন প্রথিতযশা অধ্যাপকের নিকট আমার অধ্যয়নের সৌভাগ্য হয়েছিল। কলেজ-জীবনে শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদারের নিকট সাহিত্য-সম্পর্কীয় যে পাঠ নিয়ে-

ছিলাম এই গ্রন্থ তার অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা গুরুঋণ শোধ করা যায় না। সে প্রয়াসে বিরত থেকে ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। এই গ্রন্থ প্রণয়ণের সময় শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডক্টর ভবতোষ দত্ত, ডক্টর নন্দলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী এবং অনুজ-প্রতিম অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

দীর্ঘকাল ছাপাখানার কবলিত থাকাকালীন এই গ্রন্থ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকর্মীবৃন্দ আমার উৎসাহকে জাগ্রত রেখেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক তাতে তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর প্রশ্ন ওঠেনা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থ প্রণয়ণের সময় আমাকে শুধুমাত্র উৎসাহিত করেন নি, সানন্দে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

যে সব পূর্বসূরী এই গ্রন্থ রচনায় আমার চিন্তাকে জাগ্রত করেছেন— তাঁদের সকলের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। গ্রন্থমধ্যে তাঁদের সকলের নাম এবং গ্রন্থের নাম উল্লেখ করায় গ্রন্থশেষে স্বতন্ত্র প্রমাণ-পঞ্জী সঙ্কলিত হল না।

এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করবার নীরস কাজ প্রসন্নচিত্তে সম্পাদন করেছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং ছাত্রী মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমান পবিত্র মোহন সরকার প্রত্যক্ষভাবে আমার ছাত্র না হয়েও সহযোগিতা করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এঁদের সকলের সারস্বত-সাধনা জয়যুক্ত হোক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছি প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বই এবং পুরনো পত্র-পত্রিকা সরবরাহ

করেছেন বলে আমার ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীফণিভূষণ পালকে যিনি কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত চারু হোম কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনাগুলি ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'জিজ্ঞাসা'র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র কুণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ না করলে এই গ্রন্থ এত শীঘ্র পাঠক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেত কিনা সন্দেহের বিষয়। প্রুফ্ দেখতে গিয়ে অনেক সময় কোন কোন অংশ বর্জন বা পরিবর্ধন করে শ্রীগোপাল প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার মশাইকে আমি উত্ত্যক্ত করেছি। তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ তিনি আমার সকল অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও গ্রন্থ মধ্যে কতগুলি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়ায় লজ্জা অনুভব করছি। ভ্রম সংশোধনের দ্বারা যদিও এই ত্রুটির গুরুত্ব কমেনা তথাপি গ্রন্থশেষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভুলের একটি শুদ্ধিপত্র সংকলন করে দিলাম।

এই গ্রন্থ বিদগ্ধ পাঠকের মনে আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে যদি কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
বাংলা সাহিত্য বিভাগ, **শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ**
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭

বিষয়-সূচী

কথারম্ভ পৃষ্ঠা

আধুনিকতার সংজ্ঞা বিচার-১ ॥ আধুনিকতার লক্ষণ নির্ণয়-৩ ॥ সংস্কৃতি ও সাহিত্য : পারস্পরিক সম্পর্ক-১০ ॥ আধুনিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিকাশের ক্রম-১১ ॥ আধুনিক সংস্কৃতির বস্তুগত ও ভাবগত ভিত্তি-১৫ ॥ সংস্কৃতির বস্তুগত ভিত্তি-১৫ ॥ সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি-১৭ ॥ আধুনিক সংস্কৃতি বিকাশে জাতির মানস-সম্পদ-২৪ ॥ ১—৩০

১ যুগারম্ভ ॥ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ॥ ভাববিপ্লব ॥ রামমোহন ৩১

২ সংশয় ॥ দ্বিধা ॥ ভাবক্রান্তি ॥ ঈশ্বর গুপ্ত ৪৭

৩ লোকহিত ॥ বীর্য ও প্রেম ॥ ভাষাশিল্প ॥ বিদ্যাসাগর ৬০

৪ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবদিগন্ত ॥ তত্ত্ববোধিনী সভা ॥ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার ৭৯

৫ প্রজ্ঞা ও প্রত্যয় ॥ ঐতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও রাজনারায়ণ ৯৭

৬ সাহিত্যে নবসৃষ্টি সূচনা : নাটক ॥ সৃষ্টিবেদনা ॥ রামনারায়ণ ১১৯

৭ সাহিত্যে নবসৃষ্টি সূচনা : নাটক ॥ সৃষ্টির উল্লাস ॥ মাইকেল ১২৮

৮ সাহিত্যে নবসৃষ্টি সূচনা : নাটক ॥ সৃষ্টিতে সহমর্মিতা ॥ দীনবন্ধু ১৪০

৯ গদ্যে সৃষ্টিবেদনা ॥ লোকায়ত সাহিত্য প্রয়াস ॥ সংস্কৃতি-প্রসার ॥ প্যারীচাঁদ মিত্র ১৪৯

১০ কাব্যে হৃদয়মুক্তি ॥ সচেতন শিল্পপ্রয়াস ॥ মধুসূদন ১৬৪

১১ গদ্যে রসসৃষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ সংস্কৃতির নবরূপ ॥
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮১
১২ চিন্তা-সমন্বয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত ॥ বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' ২৩১
১৩ আত্মিক শক্তি ॥ সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ সংস্কৃতির দিগন্ত-
বিস্তার ॥ কেশবচন্দ্র ২৪০
১৪ কথাশিল্পে বাস্তবচেতনা ॥ ভাবীযুগের ইশারা ॥
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৫
১৫ নাটকে বৃহত্তর জীবনস্পর্শ ॥ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ॥ সংস্কৃতির
রূপান্তর ॥ গিরিশচন্দ্র ২৮২
১৬ প্রত্যয় ও সিদ্ধি ॥ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোদ্ঘাটন ॥
সংস্কৃতি-সমন্বয় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৩
১৭ আত্মকেন্দ্রিক ভাবকল্পনা ॥ কাব্যে নবযুগের আবাহন ॥
বিহারীলাল ৩০১
সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায় স্মরণীয় তারিখ ৩০৯
নির্দেশিকা ৩১৩—৩২২

কথারম্ভ

আধুনিকতার সংজ্ঞাবিচার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনায় আধুনিক সংজ্ঞাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, বিশেষ করে সাহিত্য আলোচনায়। দশ বছর আগে যে সাহিত্যকে খুব আধুনিক বলে মনে করা হত, আজ তা একেবারে অনাধুনিক বিবেচিত হতে পারে। আবার যে সাহিত্য সাম্প্রতিক কালে আধুনিক মেজাজের জন্যে জনপ্রিয় হচ্ছে, দশ বৎসর পরে ভবিষ্যৎবংশীয়েরা সে সাহিত্যকে সেকেলে বলে নাক সিঁটকাতে পারে। এমনও দেখা যায়, প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন সব প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশ রয়েছে যা আধুনিক বলে দাবী করতে পারে; আবার বর্তমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যেও এমন সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা প্রাচীনতার লক্ষণাক্রান্ত। বৌদ্ধ যুগের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যে জীবনবোধের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, তা বর্তমান যুগের পক্ষেও আধুনিক; আবার সমকালীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন কতগুলি প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছে, যা আমাদের মধ্যযুগীয় অসংস্কৃত মনোভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায় নেহাৎ কালের বিচারে 'আধুনিক' সংজ্ঞাটি দেওয়া বোধ হয় সমীচীন নয়।

তা হলে এ প্রশ্নটি স্বভাবতঃই মনে জাগে, জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে কোন্ সময়ে; এবং সে অধুনিকতা বিচারের মাপকাঠি কি?

প্রথমে সাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। শুধুমাত্র আজ-কাল বা কিছুকাল আগে প্রকাশিত হলেই সে সাহিত্যকে আধুনিক বলা চলে না।

সাহিত্যকে 'আধুনিক' অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তখন, যখন কোন অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের (Values) প্রকাশে সে সাহিত্য পূর্বযুগের সাহিত্য হতে পৃথক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সাহিত্যের মেজাজ ও স্বাদ যেমন নতুন, তেম্‌নি সমসাময়িক যুগপ্রবৃত্তির পরিচয় ওঠে সেখানে প্রকট হয়ে। সাহিত্যে আধুনিকতা বিচারে চিন্তাশীল লেখক G. S. Fraser-এর মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন :

"......When we describe a work as 'modern' we are ascribing certain intrinsic qualities to it, though we may be vague in our minds what these qualities are. Thus the question of date need not arise at all......all through the literature of the past, there are certain works, which, in the attitudes they express and the problems they deal with, have a peculiar affinity with the spirit of our own time".[১]

এরূপ ব্যাপক মূল্যমান বিচারে আমাদের সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় কোন কোন কবিওয়ালার গানে, ময়মনসিংহ গীতিকায়, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের কাব্যে, এমনকি প্রাচীন যুগে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু আধুনিকতা বিচারে শুধুমাত্র কালনিরপেক্ষ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর নির্ভর করা সব সময়ে নিরাপদ নয়। কারণ, এ ধরণের মাপকাঠি নিয়ে বস্‌লে সাহিত্যে আধুনিকতার সীমাকে আরো প্রাচীন কাল পর্যন্ত টেনে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সেজন্যে ফ্রেজার নিজেও সাহিত্যে আধুনিক মেজাজ নির্ণয়ে একটা নির্দিষ্ট কাল ও একটা বিশিষ্ট যুগপ্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে ব্যাপক অর্থে ইংরাজী সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, তবে আলোচনার সুবিধার জন্যে তিনি সৃষ্টিধর্মী ইংরাজী সাহিত্যে আধুনিকতার প্রারম্ভসীমা ধরেছেন ১৮৯০

১ Fraser, G. S. **The Modern Writer and his world—Modernity in Literature,** p. 11.

খৃষ্টাব্দকে। বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপভাবে কোন একটা সময়কে আধুনিকতার সৃষ্টিকাল বলে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

আধুনিকতার লক্ষণ নির্ণয়

কোন খেয়ালের বশে ফ্রেজার একটা বিশেষ সময়কে আধুনিকতার প্রারম্ভসীমা বলে চিহ্নিত করেননি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ-কেন্দ্রিক ইংরাজী সাহিত্যে কতগুলি বিশেষ প্রবণতা দেখে তিনি সে সাহিত্যকে আধুনিক বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ নির্ণয়ে ফ্রেজার একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন ;—

"Paradoxically enough, one of the main marks of 'modernism' in literature is often a lively interest in the past for its own sake".[১]

যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও বিচারের সাহায্যে বর্তমানকে গড়ে তোলবার জন্যে অতীত কৌতূহলের ফলেই বাংলা সাহিত্যেও সুরু হল 'আধুনিকতা'র। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রচিত 'বেদান্ত-গ্রন্থ' সে হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যকীর্তি। সমকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয় মনকে ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে শুধু এ গ্রন্থে নয়, রামমোহনের সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সে যুগের মনীষীরাও মোহাচ্ছন্ন জাতীয় চিত্তের ভ্রান্তি নিরসনের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনা-গবেষণায়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের পরিণত মনীষা নিয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সত্য সংকলন করবার দুরূহ কাজে। উক্ত সকল মনীষীরই লক্ষ্য সমকালীন সমাজের পুনর্গঠন, কিন্তু উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দান করবার জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা অতীতে।

---

১ Fraser, G. S. **The Modern Writer and his world**—The Historical Sense in Modern Literature, p. 11.

পুরাণ ও ইতিহাসাশ্রয়ী অতীত কৌতূহলের ফলেই গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি প্রাণবন্ত নবীন সাহিত্য, যার সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যের ব্যবধান সুস্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্তের অতীত কৌতূহল-প্রবণতা একটা সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলেও, প্রাচীন কাব্য ও কবিজীবনী সংগ্রহ-ব্যাপারে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ আধুনিক। রঙ্গলালের আবেগমুখর স্বদেশপ্রেম অতীত রাজপুত ইতিহাস হতে প্রেরণা সঞ্চয় করে কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার আবাহন করেছে। নাটকে ও কাব্যে মাইকেলের মানসমুক্তির মূলে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণ। মধ্যযুগের বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মুসলমান ইতিহাসের প্রতি প্রবল মানস-কৌতূহলের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্কিমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রোমান্স, আর রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাসনিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। হেমচন্দ্র ও নবীচন্দ্রের মহাকাব্য রচনার লক্ষ্যও হল প্রাচীন হিন্দুপুরাণকে নতুন যুগের নব-ভাবধারায় অভিষিক্ত করে আধুনিক জাতিগঠন-কামনা। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের মন অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য-প্রভাবান্বিত হলেও সমকালান জীবন গঠনের স্বপ্ন যে তার ছিল না তা জোর করে বলা চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিষ্টিক কবি বিহারীলাল তাঁর আত্মমুখী ভাবকল্পনার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন সুপ্রাচীন বাল্মীকি-কাহিনীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রধর্মী অনেক কাব্যেরও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে প্রাচীন ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শ।

বর্তমানকে পুনর্গঠনের জন্যে অতীতের আদর্শ গ্রহণ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হলেও একমাত্র লক্ষণ নয়। অতীতপ্রীতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হয়ে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর সাহিত্যকে পূর্বযুগের সাহিত্য হতে পৃথক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গত শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল শাস্ত্রবিচারে ও সমাজসংস্কারে। যে তীক্ষ্ণ মানবতাবোধের প্রেরণায় গত শতাব্দীর সাহিত্য একটা নবশক্তি লাভ করল, তার মূলেও আছে একটা যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এরূপ আধুনিক দৃষ্টিস্নানে গত শতাব্দীতে প্রথম স্নাত হয়েছিলেন প্রতিভার বরপুত্র রামমোহন। শাস্ত্রবিচারে তাঁর

ক্ষুরধার নৈয়ায়িক বুদ্ধি জীবনের প্রতি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই ফল। এ দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকট প্রকাশ ডিরোজিয়ানদের মধ্যে ; অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি মনীষীদের জীবনচর্চা ও সাহিত্য রচনার মূলেও এ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

জীবনের প্রতি রসদৃষ্টিও সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টির একটা প্রধান লক্ষণ। এ দৃষ্টিস্পর্শেই গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের নীতি ও সংস্কারধর্মী সাহিত্য বাস্তবিকপক্ষে জীবনধর্মী আধুনিক সাহিত্যে বিবর্তিত হল। মানুষের জীবন শুধু সংস্কার ও নীতি-দুর্নীতির আধার নয় ;—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-প্রীতি ও প্রীতিহীনতা, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, প্রেয়লাভের মোহ ও শ্রেয়লাভের এষণা নিয়ে মানুষের জীবন পরম রহস্যময়। রসিকের দৃষ্টি দিয়ে সে রহস্যময় জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রয়াসেই সৃষ্টি হল আধুনিক সাহিত্য। জীবনের প্রতি রসদৃষ্টির আংশিক প্রকাশ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়নি একথা বলা চলে না ; কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গীর চিত্তাকর্ষক সাহিত্যরূপ দেখা গেল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্যের অভিনব টেকনিকে রচিত উপন্যাসে। সে উপন্যাস গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের রসসংস্পর্শহীন সাহিত্যে যে শুধু আধুনিকতার রঙ্ মাখিয়েছে তা নয়, এতদিনকার অনাদৃত বাংলা সাহিত্যকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষকও করেছে। শুধু উপন্যাস রচনায় নয়, কাব্য-নাটক রচনায়ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের টেকনিক গত শতাব্দীর সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্বযুগের সাহিত্য হতে। সাহিত্য রচনার এ অভিনব কৌশল (form) আবিষ্কারই সৃষ্টি করেছে গত শতাব্দীতে একটি সজীব-সাহিত্য—যাকে আধুনিক আখ্যায় অভিহিত করতে কোন বাধা নেই।

মধ্যযুগীয় ধর্মশাসিত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহাহীন জীবনের ধ্যান-ধারণার প্রতি শুধুমাত্র একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টি নয়, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গত শতাব্দীর বহু মনীষীর গভীর জীবনদৃষ্টি সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টির ভিত্তিমূলে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণযোগ্য। মধ্যযুগের জীবন ও সাহিত্য হতে আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে একদিনেই সংঘটিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাপ্রবাহ এ বিচ্ছেদকে ক্রমশঃ

স্পষ্টতর করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংরাজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নব পরিচয় সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করেছে একটা নবতর সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনায়। এ সজীব প্রাণস্পন্দন সে যুগের বিভিন্ন বাঙালী চিত্তে অনুভূত হয়েছে বিচিত্ররূপে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির খর বিদ্যুতালোকে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী হয়ে উঠলেন দেশের সনাতন জীবনদৃষ্টির প্রতি সংশয়ী, আর-এক শ্রেণীর চিন্তাশীল বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেও দেশীয় সনাতন সংস্কৃতির স্থির মূল্যবোধ সম্পর্কে অনুসন্ধানতৎপর।

কিন্তু জীবনদৃষ্টি প্রাচ্যই হোক, পাশ্চাত্ত্যই হোক, কিম্বা সমন্বিতই হোক, জীবনের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগই সৃজ্যমান বাঙালী-সংস্কৃতি যুগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সানুরাগ জীবনপ্রীতি সে যুগের বাঙালীর চরিত্রে এনে দিয়েছিল ঋজুতা এবং দৃষ্টিতে এনে দিয়েছিল গভীরতা। এ গভীরতার সাধনাই গত শতাব্দীর সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ব যুগের সাহিত্য হতে এবং উত্তীর্ণ করেছে আধুনিকতার স্তরে। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বেদান্তের মত জটিল শাস্ত্রেরও আলোচনা-গবেষণা যে নবসৃষ্ট বাংলা গদ্যের মাধ্যমে করা যায় রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের পূর্বে তা কেউ ভাবতেও পারত না। সাহিত্যরচনায় একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল রামমোহনের এ সুচিন্তিত গ্রন্থখানি। স্বদেশের সনাতন ভাবধারার শাশ্বত মূল্যবোধকে দেশের দিগ্‌ভ্রান্ত শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে রামমোহনের সুযোগ্য শিষ্য দেবেন্দ্রনাথও অগ্রসর হলেন 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় উপনিষদ প্রচারে। সে সমস্ত রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক, বাংলা ভাষা যে সুপ্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে, এ সত্য উপলব্ধি করতে সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর দেরী হয়নি। ওদিকে বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করবার গভীর আগ্রহে প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাসাগর সুরু করলেন বাংলা ভাষায় প্রাচীন শাস্ত্রবিচার। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানালোচনা ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় খুলে দিল বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে নতুন জগতের প্রবেশদ্বার। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাবৃত্ত আলোচনা ও বঙ্কিম-বিবেকানন্দের হিন্দুশাস্ত্র, বিজ্ঞান-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব এবং

ধর্মতত্ত্বের আলোচনাও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘোষণা করে সে যুগের সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিল মধ্যযুগের ধর্মচেতনানির্ভর সাহিত্য হতে।

কাব্য সাহিত্যেও আধুনিকতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল ইউরোপীয় কাব্যাদর্শের সচেতন অনুসৃতির ফলে। দেশ বিদেশের কাব্যসাহিত্য হতে মধু আহরণ করে মধুসূদন যে মধুচক্র নির্মাণ করলেন, সে যুগের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বহু বাঙালী তার স্বাদ গ্রহণ করতে না পারলেও প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে কাব্যপ্রিয় বাঙালী আজ বুঝ্তে পেরেছে, কাব্যরচনা এ ভাবোন্মাদ কবির বিলাসচর্চা মাত্র ছিল না। Form এবং Content এর দিক দিয়ে বাংলা কাব্যে এত বড় পরিবর্তন সে যুগের পক্ষে ছিল কল্পনাতীত। পূর্বযুগের তরলধর্মী বাংলা কাব্যকে গভীর রসাশ্রয়ী কাব্যসীমায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হল বাংলা কাব্যে আধুনিকতার। সে আধুনিকতার সীমা আরো প্রসারিত হল হেম-নবীনের কাব্যে সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের স্পর্শে। গভীর জাতীয়তাবোধ ও মানবতাবোধের প্রকাশে মূল্যসমৃদ্ধ হল আধুনিক বাংলা কাব্য। মধ্যযুগের কাব্য হতে গত শতাব্দীর কাব্যসাহিত্যের ব্যবধান উঠল সুস্পষ্ট হয়ে। সে ব্যবধান আরো সুচিহ্নিত হল বিহারীলালের হৃদয়রহস্যকেন্দ্রিক সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসময় গীতিকবিতার নবতর রূপপ্রকাশে। কবি-অন্তরের আনন্দ-বেদনা মথিত অনুভূতির এমন অবিমিশ্র অথচ গভীর প্রকাশ মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য।

নাটক রচনায়ও গভীর জীবনাসক্তি গত শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে বহন করে আনল আধুনিকতার সজীব বাণী। প্রথম সমাজসচেতন নাট্যকার রামনারায়ণের নাটকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় নেই, একথা সত্য; কিন্তু সমকালীন নিপীড়িত জীবনের প্রতি তাঁর সহৃদয় অন্তরে যে বেদনার রং লেগেছিল তা অকৃত্রিম। মধুসূদনের দূরযানী কল্পনা নাটক সৃষ্টিতে মুখ্যতঃ রোমান্সের সরণি বেয়ে অগ্রসর হলেও জীবনের রহস্যময় রূপও তাঁর শিল্পী-মনকে আলোড়িত করেনি একথা জোর করে বলা যায় না। নাট্যজীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তির ফলে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেক্সপীয়রের দৃষ্টিলাভ অবশ্য তাঁর ভাগ্যে জোটেনি, কিন্তু তাঁর কোন কোন নাটকে গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দীনবন্ধুর নাটকে কল্পনাবিস্তার না থাকলেও

যে বেদনালাঞ্ছিত জীবনকে তিনি দেখেছিলেন, সে জীবনের বাস্তব রূপ দানে তাঁর লেখনী ছিল অকম্পিত। তাঁর গভীর জীবনবেদনা কখনও রূপ পেয়েছে হাল্‌কা হাসির বুদ্‌বুদের মধ্য দিয়ে, কখনও বা বন্ধন-অসহিষ্ণু বিদ্রোহচেতনার ভিতর। সমকালীন জীবনসমস্যার গভীরে প্রবেশ করবার এমন অকৃত্রিম প্রয়াস সে যুগের খুব কম নাট্যকারের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াসেও এ গভীরতারই সাধনা। স্ব-ধর্মচ্যুত জাতিকে স্বদেশের সনাতন মহৎ জীবনচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর নাট্যপ্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য। পূর্বসূরী মনোমোহন বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রও যে তাঁর অন্তরে উত্তাপ সঞ্চার না করেছিল তা নয়, সমকালীন সামাজিক সমস্যার বাস্তব রূপ সম্পর্কেও তিনি যে অনবহিত ছিলেন তাও নয়; কিন্তু যে সামগ্রিক জীবনবোধের সুমহান আদর্শ যুগ যুগ ধরে জাতিকে শ্রেয় লাভের চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছে, সে ধর্মাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর পৌরাণিক ও অবতার নাটকে। আর্টের সূক্ষ্ম সীমা তিনি লঙ্ঘন করেছেন এ ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকগুলির বহু স্থানে সন্দেহ নেই; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নিকট আর্টের চাইতেও জীবন ছিল বড়। চারদিকের কেন্দ্রচ্যুত জীবন পরিবেশে সে আদর্শ জীবনের পূজা করেছিলেন ভাবধর্মী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, আর শাশ্বত ভারতীয় জীবনের মহিমা স্পর্শে জাগাতে চেয়েছিলেন তিনি সে যুগের বিভ্রান্ত বাঙালীকে।

শুধু আলোচনা-গবেষণা বা কাব্য-নাটকে নয়, উপন্যাসেও দেখি মানবজীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াস আধুনিক যুগ সম্ভাবনাকে আসন্ন করে তুলল। শিল্পী বঙ্কিমই মানবমনের সে রহস্যময় রূপকে সর্বপ্রথমে তুলে ধরলেন বাংলা উপন্যাসে কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টি-প্রেরণাই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে রইলনা। শিল্পসৃষ্টির পরিণামে তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। তীক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে নীতিধর্মের প্রেরণা প্রথম পর্যায়ের কোন কোন উপন্যাসে সক্রিয় হলেও, বঙ্কিমের শেষ স্তরের উপন্যাসগুলিতে সে প্রেরণা প্রবল প্রত্যয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। উপন্যাসে বঙ্কিমের এ গভীরতার সাধনা তাঁর শিল্পকৃতিকে উন্নীত করেছে মহৎ জীবনজিজ্ঞাসায়। শতাব্দীর শেষ কোটিতে রবীন্দ্রনাথও

জীবনের শাশ্বত আদর্শকে উপন্যাসে শিল্পরূপ দিতে সচেষ্ট। শিল্প রচনায় এ গভীরতর দৃষ্টিও আধুনিকতার চিহ্নাঙ্কিত।

এ গভীরতার সাধনাতেই গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে একটি সমৃদ্ধ মনন-সাহিত্য। গত শতাব্দীর যে রেনেসাঁস আন্দোলন আধুনিক জীবনবিকাশের মূলে, তার প্রেক্ষাপটেও রয়েছে একটা ভাবগম্ভীর মনন-সাহিত্য। শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের মুক্ত মনন নিয়োজিত হয়েছিল প্রধানতঃ ধর্মালোচনায়। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কেও তাঁর যে কৌতূহল ছিল না তা নয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা জাতির বুদ্ধিমুক্তির সাধনার উপর জোর দিতে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রালোচনায় তাঁর অমিত শক্তি তেমন নিযুক্ত হতে পারেনি।

বিদ্যাসাগরের মুক্তিস্বপ্ন প্রধানতঃ রূপ পেয়েছিল সমাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত মননশীল আলোচনায়। ভূদেবের যুক্তিনির্ভর সুমিত আলোচনাও ছিল